
চা
কোকো

ভারতের বনৌষধি

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

বনৌষধির আবিষ্কার এবং ক্রমবিকাশ

বনৌষধি আবিষ্কার করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। প্রকৃতির রত্নাগার হতে এই শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণের জন্য তারা যুগযুগান্ত ধ'রে পাগলের মতো অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে ; এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাদের "রোগের অমানুষিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।" তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না খুব বেশি—মানসিক কৃষ্টির অভাব ছিল যথেষ্টই—যে জন্য নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য যা কিছু প্রয়োজন তারও জন্য তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত প্রকৃতির উপরে। তারা জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করত বনের শাকসব্জি ফলমূল থেকে, কাপড় জামা তৈরি করত গাছের ছাল পাতা দিয়ে, আর শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত পশুর লোমের আবরণ দিয়ে। রোগযন্ত্রণায় ভুগলে অসহায়ের মতো মুখ চেয়ে থাকতো সেই প্রকৃতিরই উপরে। প্রাচীন মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছিল না খুব বেশি, আজকালকার সভ্য মানুষদের মতো কৃত্রিম ওষুধ তৈরি করে নিজেদের কষ্টের লাঘব করার উপায় ছিল না তাই তারা বনে বনে খুঁজে বেড়াতো বনৌষধি যার সাহায্যে পরিত্রাণ পেতে পারে রোগের হাত থেকে। একে একে সন্ধান মিলল ভারতীয় বনৌষধির। নদীমাতৃক শ্যামল ভারতবর্ষ প্রকৃতির ঐশ্বর্যলাভে গর্বিতা। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বনসম্পদ ভরা আছে তার কোষাগারে। এই বনজ গাছ ও লতাগুল্মাদি হতে প্রাচীন মানুষ উদ্ঘাটন করেছে প্রকৃতির গুপ্তরহস্য—আবিষ্কার করেছে ভেষজ—যা দিয়ে শুধু নিজেদেরই যে রোগমুক্তির উপায় সৃষ্টি করেছে তা নয়—ভ'রে দিয়েছে বিশ্বের জ্ঞানের কোষাগার তাদের অভিনব গবেষণায়। এই বনজ হয়েছে পরিচিত বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রে "ভারতীয় বনৌষধি" নামে। তারপর ধীরে ধীরে এই বনৌষধির ক্রমবিকাশ লাভে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে বর্তমান ভারতের ভেষজশাস্ত্র।

ভারতীয় গাছগাছড়া ও লতাগুল্মাদি হতে যে সমস্ত বনৌষধি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ব্যবহার এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা কিছু পাওয়া যায় বৈদিক যুগের

রচিত আয়ুর্বেদে। আয়ুর্বেদে মাত্র একশো বনৌষধির উল্লেখ আছে, তাই থেকে মনে হয় যে এর বেশি গাছের গুণাগুণ জানতে পারা তখনকার লোকের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হয়নি। এর পরবর্তী রচনা হচ্ছে চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতা। এই সংহিতা পড়লে মনে হয় যে বৈদিক যুগের পরবর্তী আর্যেরা অনেক বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সুশ্রুত তাঁর লিপিকায় দ্বাদশ অধ্যায়ে তখনকার ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং ভেষজ প্রয়োগের নানা প্রণালী অতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। সুশ্রুত সংহিতায় প্রায় সাতশো গাছের ভেষজগুণ বর্ণনা করা আছে কিন্তু এই সাতশো গাছের মধ্যে বেশির ভাগ ভারতীয় হলেও বৈদেশিক গাছের নামোল্লেখ কিছু পাওয়া যায়। তাঁরা যখন সংহিতা রচনা করেছিলেন তখন ব্রহ্মদেশ এবং তিব্বত থেকে নানা উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভারতবর্ষে ওষুধ হিসাবে আমদানি হ'ত। আর্যদের প্রাচীন ভেষজের মধ্যে যষ্টিমধুর ব্যবহারের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এই গাছ ভারতের নিজস্ব নয়। এর আদিম বাস এসিয়া মাইনর, আরব, পারস্য এবং তুর্কিস্থান। এই সব দেশ হতে বেদিয়ারা যষ্টিমধু সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষে চালান করত। ভারতের উর্বর মাটিতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে বর্তমানে যষ্টিমধু ভারতজাত হয়ে গেছে। চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতা বৌদ্ধযুগের আগেকার রচনা বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ সালে সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতের শহরে শহরে এবং বড় বড় রাস্তায় অসুস্থ ও আহতদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারকেরা তাঁদের প্রচারের কাজে পূর্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপান, কোরিয়া মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, তাতার, পারস্য এবং এসিয়ামাইনর পর্যন্ত ঘুরতেন এবং ভ্রমণকালে এই সমস্ত বিদেশের নানা গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষে আনতেন। এই গাছগাছড়া ভারতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে বর্তমানে ভারতীয় গাছ বলেই চলিত হয়ে গেছে। খ্রীষ্টজন্মের তিনশো বছর আগে দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে সমস্ত গ্রীক পণ্ডিত ভারতে

এসেছিলেন তাঁরা হিন্দুদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র অতি আদরের সঙ্গে পড়াশুনো করেন, ফলে ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যার যশ শুধু গ্রীসে নয়, মিসর এবং রোমে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের পর অন্যান্য গ্রীকপণ্ডিত ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ক'রে চিকিৎসার্থে ভারত হ'তে নানা প্রকার বনৌষধি গ্রহণ করেন, এইভাবে গ্রীক ও রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় আয়ুর্বেদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। বিখ্যাত গ্রীক বৈদ্য ডিওস্‌কোরাইডিস্ (Dioscorides) তাঁর গ্রন্থে হিন্দু আয়ুর্বেদের কাছে তাঁর দেশের ঋণ স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতের বহু ভেষজ প্রাচীন রোমে রপ্তানি হত। প্লিনির (Pliny) সময় এই ব্যবসার এত প্রসার হয়েছিল যে রোমের বহু সোনা ভারতে চ'লে যেতো ব'লে তিনি আক্ষেপ করেছেন।

মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তর আসে। প্রাচীন দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চায় তাঁদের অনুরাগ বিশেষ ছিল না, কিন্তু নতুন আবিষ্কার বা মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে সফলতা লাভ না করলেও জগতের প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান সযত্নে তাঁরা রক্ষা করতেন। বোগদাদের রাজদরবারে বৈদ্য ছিলেন হিন্দুরা। মুসলমান আমলে চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হিপোক্রেটাস্ ও ডিমোক্রাইটস্ প্রভৃতি গ্রীক বৈদ্যদের চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রণালী মোহম্মদের দেশবাসীরা জগতে প্রচার করেছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে ইউনানি হাকিমরাও বাদশাহদের সভায় বৈদ্য হিসাবে নিযুক্ত হতেন এবং অনেক মাইনেও পেতেন। বাদশাহের এবং প্রজাদের চিকিৎসা এই ভেষজ প্রণালীতেই চলত। ইউনানি হাকিমরা মধ্য এসিয়ার নানারকমের গাছপালার ভৈষজ্যগুণ গ্রীক বৈদ্যদের কাছ থেকে শিখে ঐ সকল গাছপালা ভারতে আমদানি করতেন। মুসলমানদের কাছ থেকে এই সমস্ত বিদেশজাত বনৌষধি নিয়ে হিন্দুরা ব্যবহার করতেন। আগন্তুক বনৌষধিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য

হচ্ছে আফিং। প্রাক্-মুসলমান যুগের হিন্দু আয়ুর্বেদে আফিং-এর কোনো উল্লেখ নেই। ইউনানি হাকিমরা এই দেশীয় গাছগাছড়া আলোচনা করে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বই লিখে গেছেন—তার মধ্যে প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে তালিকা-সেরিফ এবং মাখজান-উল্-আদ্দিয়া।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় যুগ আরম্ভ হওয়ার পর হতে চিকিৎসক এবং উদ্ভিদ্-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে দেশীয় ও আগন্তুক গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় জলপথের আবিষ্কর্তা পর্তুগীজেরা বহুকাল পর্যন্ত ভারতের হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার আশ্চর্য গুণ এবং ক্ষমতা জানতে পেরে দেশে দেশে এই ত্রিফলার অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। সিংহল, পূর্ব-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, মাকাসার প্রভৃতি অঞ্চলের নানাপ্রকার মশলা পর্তুগীজরা বিলিম ও জেনোয়ায় বণিকদের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনতেন। এই বণিকরা মুসলমানদের কাছ থেকে ঐ সমস্ত মশলা অনেক সস্তায় পেতেন। সেই থেকে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ফলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকারও আবিষ্কার হয়। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় নানারকমের গাছ সেখান হতে ভারতে আমদানি হয়ে অল্পকাল মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব আগন্তুক গাছের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়; তা ছাড়া তার মধ্যে অনেক গাছের দেশী কোনো নামও নেই। তবে নিত্য ব্যবহার্য এবং সুপরিচিত কয়েকটি গাছের আমদানি ও কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। মসুর ডাল, খেঁসারী, গাজর, বাঁধাকপি, বড় মেথি, পানমৌরি, খরমুজ, ক্ষীরা (শশা), পেঁয়াজ, রসুন, গন্ধিনা (leek), তিসি ও কাল-জীরে ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ হতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়েছে। মধ্য-এসিয়া হতে চালান এসেছে শালগম, সাদা সরষে, এক রকম কালো সরষে, গম, বিটপালং, আফিং, গাঁজা বা সিদ্ধি ও ঘোড়ানিম। আফ্রিকা থেকে এসেছে সিম, লঙ্কাসিজ, টকপালং, রেড়ী, বিলিতী আলকুশী, সরগোজা (যার তেল

সরষের তেলে ভেজাল হিসাবে ব্যবহার হয়), ধুঁধুল, ঝুমকো জবা, বড় কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল, ডালিম, এবং মশা তাড়াবার জন্য একরকম বিলিতী তুলসী। চীন জাপান থেকে আমদানি হয়েছে জবা, কর্পূর, দশবাইচণ্ডি, রঙ্গন, লকেটফল, লিচু, চীনানারিঙ্গি, বরবটি, গুলটকম্বল এবং রক্তকরবী। পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়া হতে আগন্তুক গাছগুলির মধ্যে সুপরিচিত—চালতা, চাঁপা, কাঁঠালি চাঁপা, কেনেঙ্গা, ডাম্বেল, অপরাজিতা, দেবদারু, দোপাটি, রক্তচিতা, তুলসী, রামতুলসী বাবুইতুলসী, স্থলপদ্ম, সাদাশিমুল, কামিনী, কনক চাঁপা, বোলা, বুদ্ধ নারিকেল, বাতাবী লেবু, হিমসাগর বা পাথরচুর—যাকে পূর্ব বাংলায় অনেক জায়গায় "বালা পাতা" বলে এবং সুগন্ধ বালা হিসাবে ব্যবহার করে। আয়ুর্বেদের "পাষাণভেদ" অনেকের মতে এই গাছকেই বোঝায়। বালা পাতা ভারতবর্ষে প্রথম আসে ১৭১৯ সালে, এখন ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়; এ ছাড়া আমলকী, সুপারি, তলদা বাঁশ, আরও নানাজাতীয় বাঁশ, লকুচ বা মাদার বা ডহুয়া, পুত্রঞ্জীব, তেজপাত, সেগুন প্রভৃতি এসেছে পূর্ব-এসিয়া হতে। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের পর নানা পথ দিয়ে অনেক গাছ ভারতে আসে, তার মধ্যে গোল-আলু প্রধান। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ সার টমাস্ রো-কে ভারতবর্ষে দূত হিসাবে পাঠান। তাঁকে আসফ্‌চাঁদ অতি দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য গোল-আলু খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এর আগে ভারতবর্ষে গোল-আলু ব্যবহারের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। লঙ্কা, তামাক, ভুট্টা, শাক-আলু, লজ্জাবতী, চারকোণা সিম, সূর্যমুখী, শেয়ালকাঁটা, গুলমখমল, আয়াপান, গাঁদা, নয়নতারা, কৃষ্ণকলি, দাদমর্দন, আতা, নোনা, লটকন, আমড়া, মেহগ্নি, পেয়ারা, পেঁপে, হরকরা, ফণীমনসা, কল্‌কে, বাগানবিলাস, বাগভেরেণ্ডা লালপাতা, আনারস, রজনীগন্ধা এবং কচুরীপানা এসেছে আমেরিকা হতে। ভারতে দেশীয় গাছ ছিল অনেক, তার উপর এসেছেও বিস্তর। তাদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা বা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর। প্রথম এক জার্মান বিজ্ঞানী ভন্ রিড (Von Rheed) ভারতীয় গাছগাছড়া

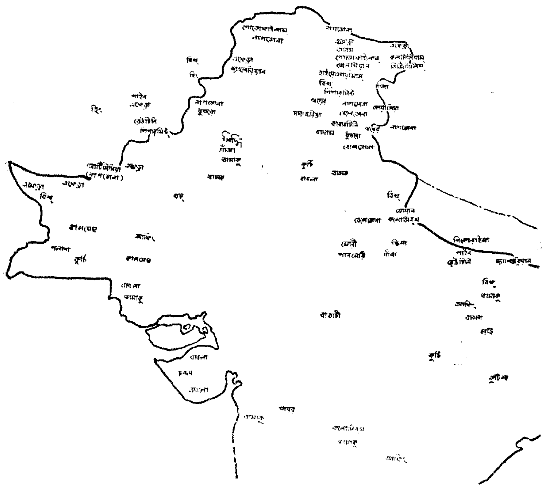
আলোচনা ক'রে তাদের সম্বন্ধে একটি বই রচনা করেন, নাম তার হর্টাস মালাবেরিকাম্ (Hortus Malabaricum)। তারপর বাংলার এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রচেষ্টায় সার উইলিয়ম জোন্সের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় বনৌষধির প্রকৃত গবেষণা আরম্ভ হয় এবং তিনিই এই বিষয়ে জনসাধারণের অনুরাগ সৃষ্টি করেন। ফলে ভারতবর্ষে অরণ্য বিভাগ এবং স্কুল অফ্ ফরেস্ট্রী স্থাপিত হয়েছে এবং বনৌষধি সম্পর্কিত অনুসন্ধান সাগ্রহে চলেছে। বড় বড় উদ্ভিদজ্ঞ—সার ডি জর্জ ওয়াট্, মিঃ গ্যাম্বল, ডাক্তার স্টুয়ার্ট, কীর্তিকর এবং বসু, ডাক্তার ওয়ারিং, ওয়ালিচ গ্রিফিথ, বেনথাম, হুকার, অধ্যাপক রক্সবার্গ, জন ফ্লেমিং, এন্‌স্‌লি প্রভৃতির সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় ভারতের নানা প্রদেশের গাছগাছড়া এবং তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তর বই রচিত হয়েছে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে ভারতজাত উদ্ভিজ্জ পদার্থের গুণ পরীক্ষার জন্যে বোম্বাই শহরে পেটিট লেবরেটরি তৈরী হয়। পরে ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারী গবেষণাগারে ভারতজাত গাছের রাসায়নিক গুণ পরীক্ষিত হতে থাকে।

বাঙ্গালোরে টাটার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে কয়েকটি কর্মী এই কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর কলিকাতার স্কুল অফ্ ট্রপিকাল মেডিসিনে ভারতজাত বনৌষধির গুণ পরীক্ষার জন্যে ৫০,০০০ টাকা দান করেন। এখন ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেশীয় গাছ-গাছড়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এই ভেষজগুলির মধ্যে যেগুলির ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে এসেছে সেগুলির গুণাগুণ ভাল করে পরীক্ষা করার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। গাছপালা চেনবার এবং ভৈষজ্য-সার নিষ্কাশনের উপযুক্ত রাসায়নিক প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। এগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন নির্ধারণের এবং কৃত্রিম উপায়ে এগুলির উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করে সাধারণের কাজে লাগানোর প্রসঙ্গে সকলের অগ্রণী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৮৯৭ সালে যখন

তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই এ বিষয়ে তাঁর নজর পড়ে। তিনি প্রথম লেবুর রস থেকে সিট্রিক অ্যাসিড (Citric acid) তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলকাতায় লেবু সস্তা না হওয়ায় বিষয়ান্তরে তাঁকে মন দিতে হয়। তারপরে কয়েকজন বিখ্যাত কবিরাজের কাছে উপদেশ এবং উৎসাহ পেয়ে কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ কর্মীর সহযোগিতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওঅর্কস প্রতিষ্ঠা ক'রে নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। কালমেঘ, বাসক, অশোক, কুর্চি, যোয়ান ইত্যাদি দেশীয় ওষুধ হতে টিন্‌চার—পরিভাষায় যাকে বলে তরলসার—তৈরি করেন। এগুলি তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ঘরে আদর পেতে থাকে। কলকাতায় এই ব্যবসার প্রসারের পর কলকাতার বাহিরেও কিছু কিছু চাহিদা হতে থাকে। বর্তমানে এই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতের সবচেয়ে বড় দেশীয় ওষুধ তৈরির কারখানা। বেঙ্গল কেমিক্যালের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ভেষজ কারখানা ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত কারখানা সৃষ্টি করার প্রধান কারণ হচ্ছে বিলিতী এবং কৃত্রিম ওষুধ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সে তুলনায় আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্জ ভেষজ খুবই সস্তা। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হলেও ভারতবাসী অত্যন্ত গরীব, তাদের দৈনন্দিন আয় এত কম যে, কোনো রকমে তারা নিজেদের ভরণপোষণ চালাতে পারে না আর অসুস্থ হলে ওষুধের দাম দিতে অক্ষম ব'লে বিনা চিকিৎসায় তাদের মরতে হয়। কাজেই গরীব ভারতবাসীদের পক্ষে দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীই সর্বতোভাবে সঙ্গত। দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অতি অল্প ব্যয়সাধ্য ব'লেই এখনও এই চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে লুপ্ত হয় নি, এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ এটি উপলব্ধি করেই ভারতীয় ভৈষজ্য শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত করবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি কি বনৌষধি পাওয়া যায় তারই কিছু ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দেওয়া গেল।



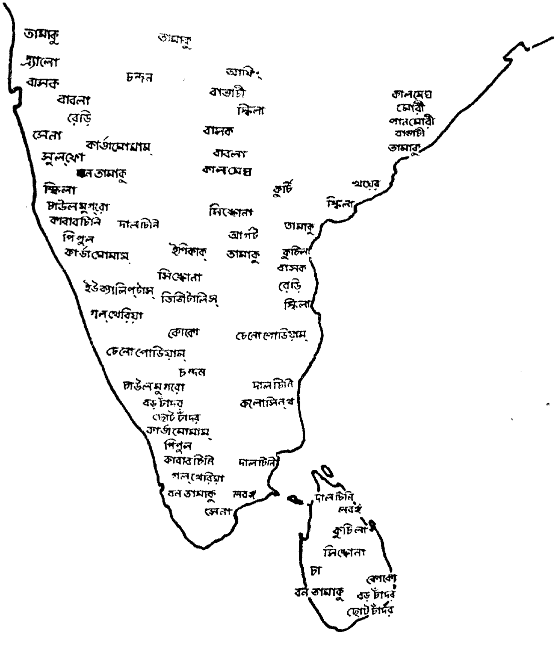
উত্তর ভারতীয় বনৌষধি

ভারতীয় গাছগাছড়ার মধ্যে যেগুলি আমাদের নিত্য ব্যবহারে লাগে বর্তমানে সেগুলিরই আলোচনা করা হবে। সুবিধার জন্য এই প্রয়োজনীয় বনজদের চারটি প্রকারে ভাগ করা হয়েছে :—

(ক) উপক্ষারধারী বনৌষধি (**Plants containing alkaloids**)

(খ) উপক্ষারহীন (অনুপক্ষার) বনৌষধি

(গ) অনুদ্বায়ী তৈলধারী বনৌষধি (Fixed medicinal oil)



দক্ষিণ ভারতীয় বনৌষধি

(ঘ) উদ্বায়ী তৈলধারী বনৌষধি (Essential or volatile medicinal oil)

(ক) উপক্ষারধারী বনৌষধি—

(১) সিঙ্কোনা (Cinchona Succirubra)

(২) কুর্চি (Holarrhena antidysenterica)



পূর্ব ভারতীয় বনৌষধি

(৩) কুচিলা (Strychnos nux vomica)

(৪) ধুতুরো (Datura stramonium)

(৫) বনতামাকু (Lobelia nicotianifolia)

(৬) আফিং (Papaver somniferum)
(৭) বাসক (Adhatoda vasica)
(৮) পিপুল (Piper longum)
(৯) বড় চাঁদর (Rauwolfia canescens)
(১০) সর্পগন্ধা (Rauwolfia serpentina)
(১১) দারুহরিদ্রা (Berberis vulgaris)
(১২) এফেড্রা ভুল্গারিস (Ephedra vulgaris)
(১৩) পেঁপে (Carica papay)
(১৪) কল্‌চিসিয়াম লিউটিয়াম (Colchicium luteum)
(১৫) আর্গট (Claviceps purpurea)
(১৬) বিশ্ (Aconitum ferox)
(১৭) কোকেন (Erythroxylon coca)
(১৮) জাবরান্দি (Pilocarpus jaborandi)
(১৯) রেড়ি (Ricinus communis)
(২০) এট্রোপা বেলেডোনা (Atropa belladona)

(খ) উপকারহীন বনৌষধি

(১) ডিজিটালিস্ (Foxglove ; Digitalis purpurea)
(২) বাভাচী (Psoralia corylifolia)
(৩) আয়াপান (Eupatorium ayapana)
(৪) বাঁদরলাঠি (বা সোনালু) (Cassia fistula)
(৫) নাগ ডোনা (Artemisia indica)
(৬) সোমরাজ (Veronia anthelmintica)
(৭) লবঙ্গলতা (Luvanga scandens)
(৮) লেবু (Citrus fruits)
(৯) গারিকুলাই (Glycine soja—the soya bean)

(১০) করঞ্জ (Pongamia glabra)
(১১) গাজর (Daucus carrota)
(১২) গাঁদা ফুল (Tagatas erecta)
(১৩) দাদমর্দন (Cassia alata)
(১৪) কালমেঘ (Andrographis paniculata)
(১৫) বেল (Aegle marmelos)
(১৬) লালবচ্ (Zingiber zerumbet)
(১৭) পলাশ (Butea frondosa)
(১৮) বাজনা (Xanthoxylum budrunga)
(১৯) হিং (Ferula asafoetida)
(২০) বনযোয়ান (Seseli indicum)
(২১) যষ্টিমধু (Glycyrrhiza glabra)
(২২) হরিণা (Vitex peduncularis)
(২৩) পুনর্ণবা (Boerhavia diffusa)
(২৪) চিরেতা (Swertia chirata)
(২৫) গোক্ষুর (Tribulus terrestris)
(২৬) কুলথ কলাই (Dolichos biflorus)
(২৭) থানকুনি (Hydrocotyle asiatica)
(২৮) নিশুন্দে (Vitex negundo)
(২৯) ব্রাহ্মী (Herpestris mouniera)
(৩০) ইসবগুল (Plantago ovata)
(৩১) রেউচিনি (Rheum emodi)

(গ) অনুদ্বায়ী তেল (Fixed Medicinal oil)

(১) চালমুগরোর তেল (Taraktogenus Kurzii এবং Hydnocarpus wightiana)

(২) সরষের তেল (Brassica campestris)

(৩) নিম তেল (Melia azadirachta)

(৪) জলপাই-এর তেল (Olive oil)

(৫) আমলকীর তেল (Phyllanthus emblica)

(৬) জয়পালের তেল (Croton tiglium)

(৭) রেড়ির তেল (Ricinus communis)

(ঘ) উদ্বায়ী তেল (Essential oil)

(১) অগুরু (Aquillaria agallocha)

(২) পুদিনা (Mentha arvensis)

(৩) সাদা চন্দন (Santalum album)

(৪) সুলফো (Anethum sowa)

(৫) লবঙ্গ (Cloves. Eugenia caryophyllum)

(৬) যোয়ান (Carum copticum)

(৭) মৌরী (Fœniculum vulgare)

(৮) আদা (Zingiber officinale)

(৯) ইউক্যালিপ্টাস্ (Eucalyptus globulus)

(১০) দালচিনি (Cinnamon cardamomum)

(১১) কাবাবচিনি (Piper cubeba)

(১২) লেবুর তেল (Citrus limonia)

বনজদের আলোচনার প্রসঙ্গে উপক্ষার কথাটির সঙ্গে পরিচয় করা যাক্। সায়ন শাস্ত্রে অম্ল (acid) ও ক্ষার (alkali) এই দুটি শব্দের ব্যবহার াছে। অম্লের রাসায়নিক গুণ ক্ষারের গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। অম্ল ক্ষারের সংযোগে সৃষ্টি হয় একটি লবণ (salt)। লেবু, তেঁতুল, আমরুল রা অম্লজাতীয় পদার্থ, আর সাবান, সোডা, সাজিমাটি, চুণের জল হ'ল ক্ষার-তীয়। গাছপালায় এই রকম ক্ষারজাতীয় জিনিস আছে—যেমন কলা

গাছকে পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় সেটির মধ্যে আছে পটাশ এবং পল্লীগ্রামে অনেকেই কলাগাছের এই সোডাজাতীয় ক্ষার দিয়ে কাপড় জামা পরিষ্কার করেন। সোডা ছাড়া সোডাজাতীয় নানা ক্ষার গাছপালায় পাওয়া যায়। সেগুলিকে বলে জৈব অর্থাৎ অর্গানিক (organic) ক্ষার অথবা উপক্ষার। সোডা চুণ এদের বলা হয় অজৈব বা (inorganic) খনিজ ক্ষার। এই উদ্ভিদজাত উপক্ষারগুলির সাজিমাটির মতন খনিজ ক্ষার পদার্থের অনুরূপ গুণ থাকলেও খনিজ ক্ষারের মতো অত তেজী নয়। চা-পাতায় যে উপক্ষারটি পাওয়া যায় সেটির নাম কেফিন—তামাক পাতার উপক্ষারকে বলা হয় নিকোটিন। দেখা গেছে যে, গাছ বা গুল্মের কোনো কোনো বিশেষ অংশে উপক্ষার সঞ্চিত হয়; যেমন নিকোটিন হয় তামাকের পাতায়, কুইনিন উপক্ষার হয় সিঙ্কোনা গাছের ছালে, স্ট্রিকনিন্ উপক্ষার থাকে কুচিলা গাছের ফলে। এই সব উপক্ষার, যাদের মধ্যে অনেকেরই চমকপ্রদ ভেষজগুণ আছে, সেগুলির গাছপালায় সঞ্চয়ের কারণ কি? এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণা করেছেন। গাছপালায় উপক্ষার কেন জমে, তার কারণ সম্বন্ধে তাঁরা যে সব যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়েছেন সেগুলি নিচে সংক্ষেপে বলা হল।

মানুষ, জন্তু, জানোয়ার, কীট পতঙ্গ প্রত্যেককেই বাঁচবার জন্যে কিছু খেতে হয়। যেটুকু খাবার তারা খায়, সেটুকুর সার পদার্থটি রক্ত মাংস মজ্জায় পরিণত হয়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করে; আর খাবারের যে অসার পদার্থ সেটি ময়লা পরিত্যাগে ও ঘামের মধ্য দিয়ে শরীর হতে নির্গত হয়ে যায়। গাছপালার মধ্যেও ঠিক এই প্রাকৃতিক নিয়ম চলেছে। বাঁচবার এবং বড় হবার জন্যে মাটি, জল, আলো এবং বাতাস থেকে তারা খাবার তৈরি করে। সেই খাবারের সারাংশে নিজেদের দেহের পুষ্টি সাধন করে, আর অসার অংশটি বর্জন করে এই উপক্ষারের মধ্য দিয়ে। জীবজন্তুদের মতো তাদের সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি নেই যাতে করে তাদের মতো ঘেমে বা ময়লা পরিত্যাগ ক'রে এই অসার জিনিস নিজেদের শরীর থেকে দূরীভূত করতে পারে।

তাই তারা এই অসার জিনিসকে কেউ উপক্ষারে, কেউ ধুনাজাতীয় আঠায় পরিণত ক'রে গাছের মূলে, ছালে বা পাতায় জড় করে রাখে। এই বর্জিত পদার্থ বেশী পরিমাণে সঞ্চয় হলে ছাল বা পাতা গাছ হতে আপনি ঝরে পড়ে যায়। তবে অনেক সময়ে দেখা গেছে যে এই উপক্ষার "মরা হাতী লাখ টাকা"র মতো কাজ করে। যেমন, উপক্ষারগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত, তেতো কিংবা ঝাঁঝালো হয় বলে জীবজন্তুদের আক্রমণ হতে গাছগুলি অব্যাহতি পায়। শুধু তাই নয় খুব শীতের দেশে গাছের ছালে উপক্ষার থাকার দরুন গাছপালাগুলি শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচে, উপক্ষারের আবরণ থাকার জন্য শীতে জর্জরিত হয়ে পড়ে না।

উপকারধারী বনৌষধি

(১) সিঙ্কোনা (Cinchona plant ; Family Rubiaceae)

সিঙ্কোনা গাছ থেকে পাওয়া যায় কুইনিন। সিঙ্কোনা গাছ সাধারণতঃ জন্মায় সমুদ্রতটের চেয়ে ৫০০০-৮০০০ ফুট উঁচুতে। এর আদিম বাস দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এবোট নামে এক পথিক আমেরিকা ভ্রমণ পথে এই গাছের সঙ্গে পরিচিত হন; তাঁর ডায়েরী হতে এই গাছের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই গাছ থেকে কুইনিন যে পাওয়া যায়, এবং সেই কুইনিন ম্যালেরিয়া ভাল করতে পারে তা কিন্তু প্রাচীন আমেরিকানদের জানা ছিল না। তাঁরা এই গাছের ছালের রং থেকে শুধু কাপড় ছোপাতেন। পেরু থেকে ইওরোপে এই গাছের প্রথম আমদানী হয় ১৬৩২ সালে। প্রবাদ আছে ১৬৩৮ সালে স্পেনের সিঙ্কোনা দেশের চতুর্থ কাউন্ট যখন পেরুতে যান—বড়লাটের পদে অভিষিক্ত হয়ে—সেখানে তাঁর স্ত্রী একবার একজ্বরীতে শয্যাশায়ী হন। অনেক রকম ভাবে তাঁর চিকিৎসা হয় কিন্তু কোনো ফল হয় না। তখন তাঁরই এক বৈদ্য এই গাছের ছালের আরক রোগিণীকে পান করিয়ে তাঁকে আরোগ্য করেন। সেই হ'তে এই গাছের নাম হয়েছে সিঙ্কোনা। বহুদিনের এই প্রবাদ কিন্তু কয়েক বছর আগে মিস্ আই. এ. রাইট সিঙ্কোনের কাউণ্টের ডায়েরী থেকে—যা অতি যত্নে তাঁর সেক্রেটারীর কাছে রক্ষিত ছিল—একেবারে মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন। কাউণ্টের ডায়েরীতে লেখা আছে যে কাউণ্টের স্ত্রী পেরুতে এগারো বছর ছিলেন কিন্তু কোনো দিন তিনি জ্বরে ভোগেন নি। কাউণ্টের স্ত্রী স্পেনে যখন ফেরেন, তখন পথে কলম্বিয়াতে কাউণ্টের পীত জ্বর হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

ইওরোপে সিঙ্কোনা গাছ আমদানী হবার পর হতেই ইংলণ্ডের বাজারে সিঙ্কোনা গাছের গুঁড়ো ছাল "জেসুইট" নামে প্রচুর বিক্রী হতে লাগল।

আমেরিকার পেরু, ইকুএডর এবং বলিভিয়া হতে এত বেশী সিঙ্কোনা ইউরোপে চালান হতে লাগল যে অচিরে আমেরিকার সিঙ্কোনাবংশ লুপ্ত হবার উপক্রম হল। তখন উদ্ভিদজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকেরা একত্রে চেষ্টা করতে লাগলেন যে কি করে ভারতবর্ষে, সিংহলে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও জাভায় সিঙ্কোনার চাষ হতে পারে, এবং তাঁরা বিশেষ ক'রে এই সব দেশেই সিঙ্কোনা চাষের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তার কারণ ভারত এবং জাভার মাটি অন্যান্য দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উর্বর এবং তাদের প্রকার বা গুণাগুণ অনেকটা আমেরিকার জমিরই মতো। ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতের উর্বর মাটিতে সিঙ্কোনা গাছ অতি অল্পায়াসেই জন্মে উঠল। বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রান্তরে হিমালয়ের পাদদেশে মংপুতে বহু বিঘা জমিতে নানারকমের সিঙ্কোনার চাষ হয়েছে। যতগুলি সিঙ্কোনা স্পিসিজের (species)র অর্থাৎ সিঙ্কোনা জাতভাই-দের আবাদ লাগান হয়েছে তার মধ্যে সিঙ্কোনা সাক্‌সিরুব্রায় (Cinchona succirubra) প্রচুর পরিমাণে কুইনিন এবং সিঙ্কোনিন্ পাওয়া যায়। এই গাছ অতি অল্পায়াসেই বেড়ে ওঠে এবং দু'তিন বছরের মধ্যেই সিঙ্কোনার ছালে কুইনিন্ তৈরী হয়। রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সিঙ্কোনায় প্রায় বিশটিরও অধিক উপক্ষার (alkaloid) আছে, তাদের নাম কুইনিন্, কুইনিডিন্, কুইনিসিন্, কুইনামিন্, কন্‌কুইনামিন্, এপিকুইনিন্, এপিকুইনিডিন্, হাইড্রোকুইনিন্, হাইড্রোকুইনিডিন্, সিঙ্কোনিন্, সিঙ্কোনিসিন্, সিঙ্কোনিডিন্, সিঙ্কোটিন্, সিঙ্কোমিডিন্, সিঙ্কোনামিন্, কোপ্রাইন্, কেইরামিন্, কন্‌কেইরামিন্, কেইরামিডিন্, কন্‌কেইরামিডিন্, কুস্‌কোনিন্, কন্‌কুস্‌কোনিন্, এরিসিন্, ডাই সিনকোনিন্, ডাইকন্‌কুইনিন্ এবং পারিসিন্। কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে লাগে মাত্র এদের চারটি, কুইনিন্, কুইনিডিন্, সিঙ্কোনিন্ এবং সিঙ্কোনিডিন্।

১৮২০ সালে প্রথম পেলেটিয়ার এবং ক্যাভেণ্টু সিঙ্কোনা গাছ হতে কুইনিন্ আবিষ্কার করেন। কুইনিনের রাসায়নিক গঠন খুব সরল নয় এবং এর গঠন সম্বন্ধে প্রায় শতাধিক বছর অনুসন্ধান চলেছে। অনুসন্ধানের মূল অভিপ্রায়

হচ্ছে গঠনটি নির্ণয় করা এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর না ক'রে গবেষণাগারেই তাকে সিন্‌থেসাইজ করা—পরিভাষায় যাকে বলে সংশ্লেষণ করা। সিঙ্কোনা গাছের উপর কুইনিনের জন্য নির্ভর করার ফলে অন্ততঃ এই ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের মহাযুদ্ধে ভারতে বিদেশ থেকে কুইনিনের আমদানি অত্যন্ত কম হয়েছে এবং ভারতবর্ষে যেটুকু কুইনিন্ তৈরী হয়েছিল সেটুকুও ভারত সরকার হস্তগত করাতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ম্যালেরিয়ায় বিনা কুইনিনে মারা গেছে।

বিজ্ঞানী লিবিগ, রেনো এবং স্ট্রেকার প্রভৃতি বহু রাসায়নিক গবেষণার পর কুইনিনের গঠন নির্ণয় করেছেন। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি তরুণ বিজ্ঞানী উড্ওয়ার্ড ও ডোয়েরিং কুইনিন্ সিন্‌থেসাইজ করেছেন। তাঁদের এই নতুন গবেষণা বিজ্ঞানজগতে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে—গবেষণার মৌলিকত্বের দিক্ থেকে শুধু নয়, বিশ্বের কল্যাণের দিক্ থেকেও। আজ যদি পৃথিবী হতে সিঙ্কোনা গাছ লুপ্তও হয়ে যায়, কুইনিন্ তৈরী হবে। পরাধীন জাতির আর বিদেশী সরকারের দয়া ভিক্ষা করতে হবে না, পরমুখাপেক্ষী হয়ে মরতে হবে না, স্বহস্তে নিজেদের রসায়নাগারে কুইনিন্ তৈরি করে নিজেদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা করে নেবে।

(২) কুর্চি (Holarrhena antidysenterica, Family Apocynaceae)

কুর্চির সঙ্গে পরিচয় ভারতবাসীর অনেকদিন থেকেই। আমাশায় কুর্চির ব্যবহার বহুদিন হতে চলে আসছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে আমাশায় এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌সানের বিধান থাকলেও প্রবীণ চিকিৎসকেরা কুর্চি-বিস্‌মাথ-আইওডাইড্ দিতে ভোলেন না। সাধারণ গৃহস্থেরা ঘরে আমাশা রোগীর চিকিৎসা করেন কুর্চির ছালের ক্বাথ খাইয়ে। কুর্চির গাছ পাওয়া যায় হিমালয় অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে এবং ভারতবর্ষের বহু অরণ্যে যেখানে বৃষ্টিপাত কিছু কম পরিমাণে হয়ে থাকে। কুর্চির দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা করে দেখা

গেছে যে এর ভেষজ গুণ কুর্চিন্, কুর্চিসিন্, প্রভৃতি কয়েকটি উপক্ষারের জন্য; এদের রাসায়নিক গবেষণা চলেছে এবং এদের গঠন সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পৌছতে পারেন নি।

(৩) কুচিলা—(Strychnos Nux vomica, Family Loganiaceae)

কুচিলা গাছের দ্রব্যগুণ প্রাচীন হিন্দুদের জানা ছিল না। বর্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রে কুচিলা এত প্রয়োজনীয় গাছ যে কি করে এই বনজ প্রাচীন যুগে অপরিচিত ছিল তা ধারণা করা যায় না। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ এই তিনটি জায়গায় কুচিলার আবাস। গাছগুলি বেশ বড়, লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট। ফুল সাদা, সাদার মাঝে সবুজের ছোঁয়া। ফলগুলি কমলালেবুর মতো বড় এবং পাকলে ঠিক কমলার মতো রং ধরে, কিন্তু খেতে ভয়ানক তেতো। কুচিলা ব্যবহার হয় সাধারণতঃ স্নায়বিক উত্তেজক হিসাবে। রোগীর হাত পা যখন ঠাণ্ডা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে তখন কুচিলার দ্রব্যসার ইন্‌জেকসান করলে দেহের উত্তাপ ফিরে আসে, স্নায়ুগুলি সতেজ হয়ে ওঠার ফলে হৃৎপিণ্ডের সচলতার সৃষ্টি হয়। কোঙ্কনদেশে কলিক্ (colic) বা শূল বেদনায় কুচিলা বীচির আরক খাওয়ান হয়। অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে যখন অনিদ্রা আসে বৈদ্যরা তখন কুচিলা অনুমোদন করে থাকেন। আফিং সেবনের বিষক্রিয়া দূর করার জন্যও রোগীকে ষ্ট্রিক্‌নিন্ ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হয়।

কুচিলার দ্রব্যগুণ অনেক রকম ভাবেই পরীক্ষিত হয়েছে। এই গাছের মধ্যে আছে দুটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ—ষ্ট্রিক্‌নিন্ (Strychnine) এবং ব্রুসিন্ (Brucine)। কুচিলার ভেষজগুণ ষ্ট্রিক্‌নিনের জন্যই।

(৪) ধুতরো—(Datura stramonium, Family Solanaceae)

ডাটুরা স্ট্রামোনিয়াম সাদা ধুতরো নামে চলিত। সাদা ধুতরো প্রচুর পাওয়া যায় সিমলাতে, সিকিমে এবং কাশ্মীরে। গুল্মজাতীয় গাছ, ফুলগুলি দেখতে ঘণ্টার মতন। গাছের পাতা, ফুল এবং ফল সব কিছুই অত্যন্ত তেতো। ধুতরোর পাতা এবং ফুল সিগারেটের মতন পাকিয়ে এবং আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়া হাঁপানি রোগীকে পান করান হয়, তাতে নিঃশ্বাসের কষ্টের লাঘব হয়। দাঁতের ব্যথা হলে ধুতরোর শেকড় গুঁড়ো করে লাগালে ব্যথা সারে। বোম্বাই শহরে ধুতরোর কাঁচা ফল ঘারভুলি নামে এবং মাদ্রাজে মারাটিয়া মুঘু নামে বিক্রী হয়। ধুতরোর বীচি বেশী পরিমাণে খেলে স্নায়বিক উত্তেজনা আনে, কিন্তু কম পরিমাণে ধুতরোর বীচি বেদনা-প্রশামক এবং শান্তিপ্রদ। ধুতরো হতে হাইওসায়ামিন্, স্কোপোল্যামিন্ প্রভৃতি কয়েকটি উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে গঠনও নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৫) বনতামাকু—(Lobelia nicotianifolia, Family Campanulaceae)

বনতামাকু দক্ষিণ ভারতের বনৌষধি। মালাবার অঞ্চলে এবং বোম্বাই হতে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত সকল জায়গাতেই বনতামাকুর গাছ যথেষ্ট জন্মায়। কয়েক বৎসর আগেও এই বনতামাকুর উপর কোনো উদ্ভিদজ্ঞের বা চিকিৎসকের বিশেষ নজর পড়েনি, কিন্তু সম্প্রতি অতি উৎসাহভরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং নানা গবেষণাগারে বনতামাকুর তথ্য অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। শুধু অনুসন্ধান নয়, বনতামাকুর টিংচার বা তরলসার ভারতের বাজারে হাঁপানি, সর্দি এবং ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের ওষুধ হিসাবে প্রচুর বিক্রী হচ্ছে। এর কারণ ১৯৩৯ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন লোবেলিয়া ইনফ্লাটার (বনতামাকুর এক জাতভাই, বাংলা নাম নেই) টিংচার বিদেশ হতে ভারতে আমদানি বন্ধ হয়ে

যায়। তখন বিজ্ঞ উদ্ভিদজ্ঞ এবং চিকিৎসকেরা ভারতে কোনোরকম লোবেলিয়া গাছ আছে কিনা এবং থাকলেও তার দ্রব্যগুণ লোবেলিয়া ইনফ্লাটার সমতুল্য হবে কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, ফলে বনতামাকুর বা লোবোলিয়া নিকোটিয়ানিফোলিয়ার গুণ জানা যায়। বনতামাকুর দ্রব্যগুণ লোবোলিয়া ইনফ্লাটারই মতো, এরও ভেষজগুণ কয়েকটি উপকারের জন্য, যদিও সেগুলির গবেষণা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। নিকোটিয়ানিফোলিয়ার গাছ সাধারণতঃ বেশ লম্বা হয় কিন্তু লম্বা হলেও গুল্মের মতন ঝোপাল। এর কাণ্ড বাঁশের কাণ্ডের মতন ফাঁপা। পাতাগুলি ঠিক তামাক পাতার মতন ঝাঁজাল, গন্ধে হাঁচি ও কাশি আসে এবং তামাকের মতোই শরীরের স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করে।

(৬) আফিং—(**Papaver somniferum, Family Papaveraceae**)

আফিং এর আমদানি হয় ভারতে মুসলমানদের রাজত্বকালে। বর্তমানে ভারতের প্রায় সর্বত্রই আফিমের চাষ হয়। বোম্বাই শহরে ও আফগানিস্থানে আফিং এত বেশী তৈরী হয় যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই আফিং চালান দেওয়া হয়। আফিং গাছ দেখতে ছোটোখাটো—এর গা থেকে দুধের মতন সাদা রস বা আঠা পাওয়া যায়। এই আঠা থেকেই তৈরী হয় আফিং। এর ফুল হয় বেশ বড় বড়, ফলগুলি সাদা। ফল হয় একটি খাপের মধ্যে, অনেকটা ঢেঁড়সের মতো। খাপের মাথায় একটি ঢাকনা থাকে। ফল যখন পাকে—উপরের ঢাকনাটি আপনি ফেটে যায় আর সমস্ত পাকা বীচি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক কাপাস বীচির মতো।

মানুষের যন্ত্রণার উপশামক হিসাবে আফিং ব্যবহার করা হয়। আফিং খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা কমে, ঘুম আসে আর স্নায়ুগুলি ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে যায়। আমরা প্রায় শুনি যে অপারেশনের পর মরফিয়া ইন্‌জেকশন্ করা হয়।

অপারেশনের যন্ত্রণার উপশমের জন্য মরফিন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। জাগলেই কষ্ট অনুভব করতে হবে তাই এই ব্যবস্থা। এই মরফিন আছে আফিমে। আফিংয়ের সমগ্র ভেষজগুণ শুধু মরফিনের জন্যই নয়, থিবেন, কডিন প্রভৃতি চব্বিশটি উপক্ষারের জন্য। অনেক সময়ে পেটের অসুখেও আফিং খাওয়ান হয়। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে আফিং খেলে স্নায়বিক শৈথিল্য আসে এবং সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

(৭) বাসক—(**Adhatoda vasica, Family Acanthaceae**)

বাসকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছোটবেলা থেকে। ছোট ছেলেমেয়েদের একটু সর্দি বা কাশির পক্ষে বাসক পাতার রস অত্যন্ত উপকারী, যদিও খেতে খুব তেতো। বাসকের গাছ হয় বেশ ঝোপাল। এর ফুলের চেহারায় বেশ বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক দূর থেকে এর ফুল দেখলেই চেনা যায়। ফুলের পাপড়ি-গুলো থাকে ফাঁক হয়ে, যেন প্রাণ ভ'রে বিশ্বের আলো বাতাস তার নিজের ভেতরে নিতে চায়। সর্দি, কাশি ও হাঁপানির চিকিৎসার জন্যে বাজারে বিক্রী হয় বাসক এক্সট্র্যাক্ট অর্থাৎ সুরাসার (alcohol) দিয়ে বাসক পাতার নির্যাস। বাসকের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, দেখা গেছে বাসকের পাতায় আছে এক উপক্ষার, নাম তার ভ্যাসিসিন্। এই ভ্যাসিসিন্‌ই বাসকের ভেষজ।

(৮) পিপুল—(**Piper longum, Family Piperaceae**)

কাশি, সর্দি এবং ঠাণ্ডায় গলা ব্যথা হলে বা গলা ভেঙে গেলে সবাই জানেন বচ এবং পিপুল খেতে হয়। পিপুল দেখতে এবং খেতে অনেকটা গোলমরিচের মতন এবং অত্যন্ত ঝাঁজালো। পিপুলের ভেষজ রাসায়নিকটির নাম হচ্ছে পাইপারিন্।

(৯) বড় চাঁদর—(Rauwolfia canescens, Family Apocynaceae)

আয়ুর্বেদে বড় চাঁদরের সম্বন্ধে কোনো বিবরণ বা উল্লেখ কিছু নেই। বাংলাদেশে কোনো এক অনাদৃত স্থানে এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোট্ট ছোট্ট ঝোপাল গাছ, তাতে সাদা সাদা ফুল, সেই ফুলের পাশে টকটকে লাল ফল—কুঁচের মতো লাল আর পাকা ফলের লাল রংএর মধ্যে বেগুনীর ধরেছে ছোঁয়াচ, লালকে ক্রমে বেগুনী করে দিচ্ছে। এই গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এরও মধ্যে আছে চকচকে এক রাসায়নিক—নাম হয়েছে রাউলসিন্—যার ভেষজগুণ প্রমাণিত হয়েছে অত্যন্ত চমকপ্রদ। তাই বড় চাঁদরের স্থান আজ ভারতীয় বিরাট বনৌষধি-সভার মাঝখানেই।

বাংলাদেশে যে সব জায়গায় মানুষের নজর পড়ে না—যেখানে লোকে ফেলে নোংরা, আবর্জনা—সেই নোংরা এবং স্যাঁতা জায়গায় অতি অযত্নের মধ্যে বেড়ে ওঠে এই বড় চাঁদরের ঝোপ। দক্ষিণ বাংলায়, ডায়মণ্ডহারবারের গাঙের ধারে এবং হাওড়ায় শিবপুর বাগানের পাশে এক স্যাঁতা জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে বড় চাঁদরের বিরাট জঙ্গল, যেন সবটাই তার নিজের জমিদারী।

শুধু বাংলাদেশই এই গাছের আবাস নয়, দাক্ষিণাত্যে, উত্তর সীমান্তে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং সিংহল উপদ্বীপেও এই গাছ পাওয়া যায় বিস্তর। লম্বায় তারা প্রায় ছ'ফুট। পাতাগুলি রোমে ভর্তি আর নরম ঠিক মখমলের মতো। বড় চাঁদরের ফুলগুলি ছোট্ট ছোট্ট, দেখতে সাদা। ফল প্রথমে থাকে সবুজ, তারপর লাল, শেষে ঘন বেগুনী হয়ে যায় ঠিক পুঁই মেটুলির মতো। পাতা থেকে ফল পর্যন্ত সবই অত্যন্ত তেতো। গাছের সকল অংশ থেকেই রাউলসিন পাওয়া যায়। রাউলসিন উত্তেজিত স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে। রক্তের চাপকে কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনে। দেহের স্নায়ুচক্রের (nervous system) উপর রাউলসিনের আশ্চর্য প্রভাব। সম্প্রতি রাউলসিনের

ভেষজগুণ পরীক্ষা করে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেছেন যে রাউলসিন্ পাগলের চিকিৎসায় নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১০) সর্পগন্ধা, ছোট চাঁদর—(**Rauwolfia serpentina, Family Apocynaceae**)

বনৌষধি হিসাবে ছোট চাঁদরের ব্যবহার অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। একে সর্পগন্ধা বলা হয় কারণ এর শেকড় দেখতে অনেকটা সাপের মতো। তাছাড়া একটি চলতি গল্প আছে, সর্পগন্ধা নামের ইতিহাস সম্বন্ধে। বেঁজিরা সাপের সঙ্গে লড়াই করবার পর যখন দুর্বল এবং সাপের বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ে তখন ছুটে বনের ভিতর গিয়ে এই ছোট চাঁদরের পাতা তারা চিবিয়ে খায়, ফলে কোনো অপকার তাদের হয় না; যদিও গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণভাব। পাটনার নামকরা হাকিমী ওষুধের মধ্যে ছোট চাঁদরের বেশ সুনাম আছে। বাংলা, ডেরাডুন, আফগানিস্থান, হিমালয়, কাশ্মীর এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে ছোট চাঁদরের গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। অনেক পাগল এই গাছের শেকড়ের গুঁড়ো খেয়ে একেবারে ভালো হয়ে গেছেন। বর্তমানে পাগলদের যে W. C. Roy-এর বড়ি খাওয়ান হয় সেই বড়ির মধ্যে আছে ছোট চাঁদরের মূলচূর্ণ আর কিছু আফিং। সর্পগন্ধার দ্রব্যগুণ হচ্ছে স্নায়বিক শিথিলতা এনে রক্তের চাপ কমিয়ে দেওয়া এবং উত্তেজিত স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করা। শুধু তাই নয়, রোগীকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে অনিদ্রায় ছোট চাঁদরের ব্যবহার খুবই চলিত। ১৮৯০ সালে গ্রেস্‌হফ নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক ছোট চাঁদরের দ্রব্যগুণের রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে তাতে উপক্ষার আছে ধরতে পেরেছিলেন। প্রায় দেড়শো বৎসর পরে ১৯২৯ সালে সর্পগন্ধার সম্যক্ গবেষণা আরম্ভ হয় এবং এর শেকড় হতে কয়েকটি উপক্ষার এবং একটি ধুনোজাতীয় জিনিস পাওয়া যায়। স্নায়বিক স্নিগ্ধতা ও রক্তচাপের হ্রাস হয় এই উপক্ষার কয়টির জন্য, কিন্তু ঘুম আনে এই ধুনো জাতীয় পদার্থ। এই

উপক্ষারগুলির নাম দেওয়া হয়েছে আজমালিন, আজমালিনিন্, আজমালিসিন্, সার্পেন্টিন্ এবং সার্পেন্টিনিন্। আজমালিন নাম হয়েছে দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁর সম্মানার্থ এবং সার্পেনটিন্ নাম হয়েছে শেকড়ের গঠন হতে, যার জন্য গাছটির নাম সর্পগন্ধা।

(১১) দারুহরিদ্রা—(Berberis vulgaris, Family Berberideae)

দারুহরিদ্রা একজাতীয় বনৌষধি। এর কাঠের রং হলদে বলে এর নাম দারুহরিদ্রা। আয়ুর্বেদে দারুহরিদ্রার ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে। পাণ্ডুরোগে (anæmia) বা যকৃতের দোষে (liver) চোখ হলদে হলে দারুহরিদ্রার ক্বাথ খাওয়ান হয়। দুধ এবং দারুহরিদ্রার ক্বাথ সমানভাগে একসঙ্গে মিশিয়ে ফোটালে, রসাঞ্জন বা রসোত ব'লে একটি ঘন চট্‌চটে পদার্থ তৈরী হয়, সেটি চোখের অসুখের পক্ষে খুব ভালো ওষুধ। ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুললে রসোত জলে গুলে একটু গরম করে চোখের চারি দিকে প্রলেপ দিলে সদ্য সদ্য উপকার পাওয়া যায়। আধুনিক রাসায়নিকেরা দারুহরিদ্রা হতে একাধিক উপক্ষার আহরণ করেছেন। তার মধ্যে বার-বেরিন (Berberine) উপক্ষারটির পরিমাণ সমধিক। দারুহরিদ্রার ভেষজগুণ এই বারবেরিনের জন্য। বারবেরিনের আরও একটি বিখ্যাত ভেষজ গুণ আছে, ওরিয়েণ্ট্যাল সোর নামে এক রকম ক্ষতরোগে বারবেরিন অব্যর্থ ওষুধ। গাড়োয়াল ও বিহার অঞ্চলে এখনও বাজারে বেদেরা দারুহরিদ্রা বিক্রি করে। টোট্‌কা ও কবিরাজী ওষুধ হিসাবে বারবেরিনের যথেষ্ট ব্যবহার এখনও প্রচলিত। পেটের অসুখে, আমাশয়ে এবং গ্রহণীরোগে বারবেরিনের প্রয়োগ আয়ুর্বেদে উল্লেখ করা আছে। মে অ্যাণ্ড বেকার (May and Baker) নামে এক ওষুধ ব্যবসায়ী বারবেরিন উপক্ষারের দ্রবণ

(a solution of berberin in water) 'ওরিসল' (Orisol) নাম দিয়ে বাজারে বিক্রি করেন। ওষুধ ছাড়া রং (dye) হিসাবেও দারুহরিদ্রার প্রচলন আছে। ঘিয়ের ব্যবসায়ীরা ঘিয়ের সোনালী রং করেন দারুহরিদ্রার লাঠি দিয়ে।

দারুহরিদ্রার ফল অনেকটা বৈঁচির মতো দেখতে, ঐ রকম ঘন বেগুনী রং। কালিফোর্ণিয়ায় দারুহরিদ্রার ফলের চাষ হয়, খেতে বেশ সুস্বাদু।

সারা ভারতবর্ষে ১৪-১৫ রকমের দারুহরিদ্রা পাওয়া যায়। বিশেষ করে হিমালয়ে দারুহরিদ্রা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। উত্তর এবং পশ্চিম হিমালয়ে এক হতে চার হাজার ফুট উঁচুতে দারুহরিদ্রার গাছ দেখা যায়। সিকিম এবং তিব্বত অঞ্চলে প্রায় ষোল হাজার ফুট উঁচুতে পাথর এবং কাঁকরপূর্ণ জমিতেও দারুহরিদ্রার গাছ বেশ ঝোপাল হয়ে জন্মায়। ১৯৩৩ সালে তিব্বতের রঙটু উপত্যকায় কাপ্তেন কিংডন্ ওয়ার্ড সাহেব এক নতুন জাতের দারুহরিদ্রা আবিষ্কার করেছেন, নাম তার দেওয়া হয়েছে বারবেরিস ক্রাইসোফেরা (Berberis chrysophaera), কারণ এর ফুল হয় সোনার মতন হল্‌দে আর দেখতে গোল। গ্রীক ভাষায় Chrysophaeraর মানে সোনার গোলক (golden globe)। কোনো জাতীয় দারুহরিদ্রা কাঁটাযুক্ত ঝোপ, কোনোটি বা দশবারো হাত উঁচু গাছ। দারুহরিদ্রার সর্বাঙ্গ কাঁটায় ভরা, এমন কি পাতার ধারে ধারে পর্যন্ত কাঁটা, তাই এদের নাম বারবেরিস।

(১২) এফেড্রা ভুল্‌গারিস্—(**Ephedra vulgaris, Family Gnetaceae**)

এফেড্রা ভুল্‌গারিস্ আমসানিয়া বা ছেনা নামে পরিচিত। এদের আবাস আফগানিস্থান, সিকিম, হিমালয় এবং কাশ্মীর। এরা ঝোপাল গুল্মশ্রেণীর গাছ। এফেড্রা গাছের নিষ্কাশ পানে হজমের উন্নতি হয়। এফেড্রা হতে যে উপক্ষারটি পাওয়া গেছে সেটির নাম এফেড্রিন্। এই এফেড্রিন্ চোখে দিলে

চোখের মণি বড় হয়ে যায়, তাতে ক'রে চোখের ভিতরকার অংশগুলি ভাল করে পরীক্ষা করবার সুবিধা হয়। চোখের মণি বড় করাকে বলা হয় মিড্রিয়াসিস্। চশমা নেবার আগে চোখের আভ্যন্তরিক পরীক্ষা করা হয় এই ভাবে এফেড্রিনের সাহায্যে।

(১৩) পেঁপে—(Carica papay, Far y Passifloraceae)

পেঁপে খুব হজমী এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখে। দুজন চীন বৈজ্ঞানিক টো (To) এবং কিউ (Kyu) পেঁপের উপক্ষার গবেষণা করে বার করেছেন, নাম কার্পেন। তাঁরা বলেছেন যে আমাশার পক্ষে কার্পেন বেশ উপকারী।

(১৪) কলচিসিয়াম লিউটিয়াম—(Colchicium lutium Family Liliaceae)

কলচিসিয়াম লিউটিয়ামের বাংলা কোনো নামকরণ হয় নাই, তবে হিন্দীতে বলে হিরণতুতিয়া। কাশ্মীর এবং পাশ্চাত্ত্য হিমালয়ে হিরণতুতিয়ার গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। হিরণতুতিয়া দেখতে অনেকটা ওলগাছের মতন, কাণ্ডটিও হয় ঠিক ওলেরই মতন মাটির তলায়। ফলের রং সোনালী। ভারতবর্ষের বাজারে দু'রকমের কলচিসিয়াম বিক্রী হয়। এক রকম খেতে তেতো আর দ্বিতীয়টি মিষ্টি। মিষ্টি কলচিসিয়াম আমদানী হয় ভারতে পারস্য হতে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা প্রথমে বলেছিলেন যে মিষ্টি কলচিসিয়ামের বনৌষধি হিসেবে কোনো উপকারিতা নেই কিন্তু রাউলপিণ্ডিতে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মাঠে খেলতে খেলতে এই মিষ্টি কলচিসিয়াম খেয়ে খানিকক্ষণ পরে তার বিষক্রিয়ায় মারা যায়। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মিষ্টি কলচিসিয়াম বিষাক্ত বনৌষধি। কলচিসিয়ামের মধ্যে যে উপক্ষারটি আছে সেটির নাম কলচিসিন্—বাতের পক্ষে এটি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ।

অনুপক্কার বনৌষধি

(১) ডিজিটালিস্—(Digitalis purpurea, Foxglove, Family Scrophulariaceae)

ডিজিটালিস্ হিমালয় অঞ্চলে বিস্তর পাওয়া যায়। এর মূলে, কাণ্ডে, পাতায় সর্বত্র তেতো এবং বিষাক্ত দুটি জিনিস আছে—এদের নাম ডিজিটক্সিন্ এবং ডিজিটালিন্। ডিজিটালিসের ফুল দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মতো। এই গাছ বিষাক্ত হলেও বনৌষধি হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। অতি অল্প পরিমাণে ডিজিটালিস্ হৃৎপিণ্ডের কাজের সহায়তা করে এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক হিসেবে ডিজিটালিসের ব্যবহার খুবই চলিত। যখন কোনো রোগীর বা সাধারণ মানুষের কোন কারণে সমস্ত স্নায়ু, শিরা এবং প্রশিরা শিথিল হয়ে গিয়ে তার শরীরের যন্ত্রপাতি স্বাভাবিক কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ কমে আসতে থাকে, তখন ডিজিটালিস্ ইন্জেকশন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই ডিজিটালিস্কে বলা হয় "Pendulum of the Heart", অর্থাৎ অক্ষম হৃৎপিণ্ডকে শক্তি যোগান দিয়ে সচল করে তোলে। এ ছাড়া ড্রপ্সি রোগেও (dropsy) ডাক্তারেরা ডিজিটালিস্ অনুমোদন করে থাকেন।

(২) বাভাচী—(Psoralia corylifolia, Family Leguminosae)

বাভাচী ফল হয় গুটির মতো। এর বীচি থেকে প্রচুর তেল পাওয়া যায়, সেই তেল নানাপ্রকার চর্মরোগে এবং শ্বেতকুষ্ঠে ব্যবহার করে অতি চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। বাভাচির তেল ক্রিমি এবং পিত্ত নাশক। এর মধ্যে কতকগুলি ভেষজ আছে, তাদের মধ্যে সোরেলিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) আয়াপান—(Eupatorium ayapana, Family Compositae)

আয়াপান গাছ ভারতে প্রথম আমদানী হয় আমেরিকা থেকে। এখন ভারতের শ্যামল উর্বর জমিতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে ভারতীয় হয়ে গেছে। আয়াপানের গাছ লম্বায় প্রায় ৫-৬ ফুট। ডালপালাগুলি তার সোজা সোজা, লোমে ভরা, তাতে আবার লালের আভা। আয়াপানের বেশ একটি সুগন্ধ আছে, কিন্তু এর পাতা খেতে ভয়ানক তেতো। আয়াপানের দ্রব্যগুণ নানারকমের। আয়াপানের পাতায় দুটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে—একটির নাম আয়াপিন্, আর একটির নাম আয়াপানিন্। এই জিনিসগুলি কুমারিন জাতীয়, যেগুলি পাওয়া যায় টঙ্কা-বীন (Tonka bean) বা হিজলী বাদাম ইত্যাদিতে। আয়াপিন্ এবং আয়াপানিনের রক্ত বন্ধ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। শিরা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে আয়াপিন বা আয়াপানিনের প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায় শুধু তাই নয় শরীরের কোনো আভ্যন্তরিক যন্ত্র আহত হওয়ার ফলে যদি রক্তপাত হয় তা হলে আয়াপিন খাওয়ালেও রক্তপাত বন্ধ হয়। বর্তমানে আয়াপিন্ এবং আয়াপানিন্ আয়াপেকটিন্ ট্যাবলেট নামে রক্ত বন্ধের ওষুধে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

(৪) বাঁদরলাঠি—(Cassia fistula, Family Leguminosae)

বাঁদরলাঠির ভাল নাম সোনালু। এর ফল হয় খুব লম্বা লম্বা শুঁটির মধ্যে—শুঁটিগুলি প্রায় ২ ফুট লম্বা। ফল যখন পাকে তখন বীচি হয়ে যায় একেবারে কালো। সোনালুর বীচি থেকে জোলাপ তৈরী হয়। এর শেকড় এবং ফলের নির্যাস জ্বরের পক্ষে উপকারী।

(৫) আর্টিমিসিয়া ইন্‌ডিকা—(Artemisia indica, Family Compositae)

এর বাংলা নাম নাগডোনা, সংস্কৃত নাম গ্রন্থপর্ণী। পার্বত্য অঞ্চলে এদের আবাস। পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া, মণিপুর, আফগানিস্থান এই সব জায়গায়

নাগডোনার গাছ এত বেশী যে তারা সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি করে ফেলেছে। নাগডোনা লম্বায় প্রায় আট ফুট। একটি তীব্র সুগন্ধ থাকা সত্ত্বেও এর স্বাদ ভয়ানক তেতো। নাগডোনার কাথ ক্রিমির পক্ষে উপকারী। এর দ্রব্যসারটির নাম স্যাণ্টোনিন্।

(৬) সোমরাজ—(Veronia anthelmintica, Family Compositae)

সোমরাজ অতি পরিচিত গাছ। পল্লীগ্রামে সোমরাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় প্রায় সকলেরই আছে। ভারতের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সোমরাজের সাম্রাজ্য। সোমরাজের বীচি থেকে একটি তেতো জিনিস পাওয়া যায়, সেটি ক্রিমির অমোঘ ওষুধ বল্লেও চলে। সোমরাজের বীচি থেকে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। এই তেল চর্মরোগে এবং শ্বেতকুষ্ঠে বিশেষ উপকারী।

(৭) লবঙ্গলতা—(Luvanga scandens, Family Rutaceae)

অষ্টবজ্র নামে কবিরাজদের একটি ভেষজ আছে, আটটি বনৌষধির সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এই আটটি বনৌষধির মধ্যে কাকলী একটি (লবঙ্গলতার দেশীয় চলতি নাম), বাকী সাতটি হচ্ছে, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, ঋষভ, জীবক, মহামেদা এবং ক্ষীরকাকলী কাকলী আসাম এবং চট্টগ্রাম থেকে ভারতের নানাস্থানে চালান যায়। কাকলীর ফল হয় আকারে পায়রার ডিমের মতো, পাকলে হয় হলদে। ফলের উপর কয়েকটি খাঁজ দেখতে পাওয়া যায়; সেই খাঁজের মধ্যে সুগন্ধি তেলের গ্রন্থি আছে। তেলের গন্ধ অনেকটা ইউক্যালিপটাসের মতো। এক-একটি ফলে তিন-চারটি করে বীচি থাকে। আসাম এবং পূর্ববঙ্গে কাকলী হতে যে সুগন্ধি তেল তৈরী হয় সেটি কাকলা নামে বাজারে বিক্রী হয়।

লবঙ্গলতার রাসায়নিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এর মধ্যে পাঁচটি কুমারিন্ জাতীয় পদার্থ আছে যেগুলির জন্যে লবঙ্গলতার ভেষজ হিসাবে বাজারে এত সুনাম। এই জিনিসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জ্যান্থাইলেটিন্ (xanthyletin)

জ্যানথোজাইলেটিন্ (xanthoxyletin), জ্যান্থোটক্সিন্ (xanthotoxin), আইসোপিম্পিনেলিন্ (isopimpinellin) এবং লুভাঙ্গেটিন্ (luvangetin)

(৮) লেবু—(Citrus fruits, Family Rutaceae)

লেবু অনেক রকমের হয় যেমন পাতিলেবু, কাগজি লেবু, কমলা লেবু, বাতাবি লেবু, সরবতী লেবু ইত্যাদি। পাতি লেবু বা কাগজি লেবুর রস অত্যন্ত টক, এদের রসে আছে সিট্রিক (citric) অ্যাসিড। কমলা লেবু এবং বাতাবি লেবু খেতে মিষ্টি। এদের রসে আছে দ্রাক্ষা শর্করা (grape sugar)। লেবুর রস হজমী এবং বমির পক্ষে উপকারী। লেবুর পাতায় এবং লেবুর খোসায় একটি সুগন্ধি তেল আছে। লেবুর রসে প্রচুর ভাইটামিন্ সি (vitamin C) পাওয়া যায়। ভাইটামিন সি-এর অভাবে নানারকম চর্মরোগ (কাউর প্রভৃতি) এবং স্কার্ভি (scurvy) রোগ হয়, দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। এই সব রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় লেবুর রস খেলে।

(৯) গারিকুলাই—(Glycine soja, soya-bean, Family Leguminosae)

গারিকুলাই-এর গাছ লতানে। খাসিয়া পাহাড়, নাগাপাহাড় এবং কুমায়ুন থেকে সিকিম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই গারিকুলাই-এর গাছ পাওয়া যায়। গারিকুলাই-এর ফল হয় শিম বরবটির মতো শুঁটির মধ্যে। এই ফলে প্রচুর তেল, শ্বেতসার (starch) এবং ভাইটামিন পাওয়া যায় সেজন্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে গারিকুলাই বা সয়াবিনের ব্যবহার খুবই চলিত।

(১০) করঞ্জ—(Pongamia glabra, Family Leguminosae)

করঞ্জের বীচির তেলে স্ক্যাবিস্ অর্থাৎ খোস জাতীয় চর্মরোগ ভাল হয়। করঞ্জ ভারতের প্রায়ই সর্বত্রই পাওয়া যায়।

(১১) গাজর—(Dacus carrota, Family Umbelliferae)

গাজর হয় মাটির তলায়। গাজরের বীচি হয় মৌরী, পেঁয়াজের মতন

থোকা থোকা, তাকে ইংরাজীতে বলে আম্বেল (umbel)। যকৃতের দোষে চোখ হলদে হলে রোগীকে গাজর খাওয়ান হয়। গাজরের গায়ে যে রংটি দেখতে পাওয়া যায় সেটিকে বলে ক্যারোটিন্ (carotene)। এই ক্যারোটিন আমাদের শরীরের মধ্যে গিয়ে ভাইটামিন্ 'এ' (vitamin A)-তে পরিবর্তিত হয়। ভাইটামিন্ 'এ' অভাবে চোখের দৃষ্টি কমে যায়, চামড়া ঝুলে পড়ে, রাতকানা হয় ইত্যাদি। কাজেই গাজর আমাদের যোগান দেয় শুধু শ্বেতসার (starch) বা ক্যারোটিন নয়—ভাইটামিন 'এ' পর্যন্তও।

ভাইটামিন প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার যে কি কি ভাইটামিন আমাদের কাজে লাগে। সুস্থ শরীরে বাঁচতে গেলে ভাইটামিন এ, বি, সি, ডি এবং ই এদের বিশেষ প্রয়োজন। 'এ' সাধারণতঃ পাওয়া যায় জন্তু জানোয়ারদের চর্বিতে, দুধে এবং কয়েক জাতীয় মাছের (কড্, হাঙ্গর, মৃগেল, তিমি ইত্যাদি) যকৃতের তেলে এবং মাংসে। কিন্তু এসব ছাড়াও শাকসবজি, গাজর এবং বাঁধাকপি থেকে ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'ই' পাওয়া যায় উদ্ভিজ্জ তেলে এবং গমের অঙ্কুরে। এদের কাজ প্রাণীদের সন্তান উৎপাদনের শক্তি দেওয়া। ভাইটামিন 'সি পাওয়া যায়, আগেই বলা হয়েছে লেবুর রসে এবং টাটকা সবজিতে। লেবুর রসে ভাইটামিন 'সি' ছাড়া আরও একটি ভাইটামিন পাওয়া যায়। এটির নাম ভাইটামিন 'পি'। স্কার্ভি রোগে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করে এই 'পি' ভাইটামিন। 'ভাইটামিন 'বি'-এর কাজ বেরিবেরি এবং স্নায়ুঘটিত রোগ নিবারণ করা। টাট্‌কা সব্‌জিতে এবং মুগ, ছোলা, গম ইত্যাদি বীজের অঙ্কুরে এই ভাইটামিন থাকে। কাজেই টাট্‌কা সবজি, গম, ছোলা এবং গাজর ইত্যাদিও প্রয়োজনীয় বনৌষধি সন্দেহ নেই।

(১২) গাঁদা ফুল—(Tagatas erecta, Family Compositae)

এই ফুলের জন্মস্থান আমেরিকা। প্রায় দেড়শো বছর আগে ইওরোপ হতে এই ফুলের আমদানি হয় ভারতবর্ষে, এজন্য প্রাচীন কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে

গাঁদাফুলের উল্লেখ নেই। শীতের প্রথম হতে বসন্তের শেষ পর্যন্ত এই ফুল ফোটে। এ ফুলে পাওয়া যায় একটি রঞ্জন দ্রব্য সেটির ভেষজগুণ রক্ত বন্ধ করা।

(১৩) দাদমর্দন বা দাদমারি (Cassia alata, Family Leguminosae)

দাদমর্দনের পাতার রসে দাদ এবং কাউর ঘা সারে। এই রসে যে ভেষজটি আছে সেটির নাম ক্রাইসোফেনিক অ্যাসিড (chrysophanic acid)

(১৪) কালমেঘ—(Andographis paniclata, Family Acanthaceae)

কালমেঘ গুল্মজাতীয় গাছ এবং খেতে অত্যন্ত তেতো, সেজন্য সংস্কৃতে এর নাম মহাতিক্ত বা তিক্তরাজ (king of bitters)। বাংলাদেশে অনেকস্থানে একে বলে আলুই। এর হিন্দি নাম মাহাটিয়া। ক্ষুধামান্দ্য ও যকৃতের দোষে কালমেঘের রস অতি সুফলদায়ক। কালমেঘের পাতায় যে তেতো ভেষজটি আছে সেটির নাম এন্ড্রোগ্রাফিন।

(১৫) বেল—(Aegle marmelos, Family Rutaceae)

বেলকে বলা হয় শ্রীফল। বেল ব্যবহার করা হয় আমাশায়, পেটের এবং হজমের গোলমালে।

(১৬) লালবচ—(Zingiber zerumbet, Family Zingiberaceae)

বচ, আদা এবং হলুদের গাছ একই পর্যায়ের। লালবচের রং হলদে এবং ভয়ানক ঝাঁজালো। সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপশম হয় লালবচের আরক খেলে। বচের মধ্যে আছে কয়েকটি হলুদ রং-এর রঞ্জন দ্রব্য, কার্বলিক অ্যাসিড জাতীয় একটি তরল পদার্থ এবং ইউক্যালিপটাসের তেলের মত একটি তরল সুগন্ধি।

তৈলধারী বনৌষধি

(১) Taraktogenos kurzii (N. O. Bixinae)

এই গাছের বাংলা নামকরণ কিছু নেই তবে ব্রহ্মদেশে একে বলে কালানয়ো। এই গাছ জন্মায় সিলেট ও চট্টগ্রামের বনে। এই গাছ উচ্চে প্রায় ৪০-৫০ ফুট এবং এর পাতা লম্বায় প্রায় ৭-১০ ইঞ্চি। ট্যারাকটোজেনাসের বীচি থেকে চালমুগরোর তেল পাওয়া যায়। এই তেল কুষ্ঠের ওষুধ। কুষ্ঠগ্রস্ত জায়গায় এই চালমুগরোর তেল ইনজেকশন করলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠ ভালো হয়ে যায়।

চালমুগরোর তেলের বদলে আরও একটি গাছের বীচির তেল ব্যবহার হয়। এই গাছের নাম কোটি (Hydnocarpus wightiana)। কালানয়ো এবং কোটির তেলে আছে দুটি অ্যাসিড। একটির নাম চাউলমুগরিক অ্যাসিড (chaulmoogric acid) এবং দ্বিতীয়টির নাম হিডনোকার্পিক অ্যাসিড। এদেরই কুষ্ঠরোগ সারাবার ক্ষমতা আছে।

(২) অগুরু—(Aquilaria agallocha, Family Thymelaceae)

হিমালয়ের পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলে, ভুটানে, সিলেট এবং ত্রিপুরায় অগুরুর গাছ প্রচুর জন্মায়। অগুরু গাছ উঁচুতে প্রায় ৩০-৪০ ফুট। এর ডালপালা এবং পাতা রেশমের মতন চক্‌চকে। অগুরু গাছের সুগন্ধ এর নিজস্ব নয়। এক রকম পরভোজী গাছ (fungus) এই অগুরু কাঠে বাঁসা বাধে। অগুরুর গাছ থেকে তারা খাবার নেয় আর তার পরিবর্তে তারা অগুরু কাঠে সুগন্ধির সৃষ্টি করে। এই পরভোজী গাছটির বিনা সহায়তায় সুগন্ধি উদ্বায়ী তেলটির (essential oil) সৃষ্টি সম্ভব নয়।

নিম তেল, চন্দন তেল, ঘা-পাঁচড়ার পক্ষে খুব উপকারী। দালচিনির তেল,

তৈলধারী বনৌষধি

ইউক্যালিপ্‌টাসের তেল, আদার তেল, লবঙ্গের তেল, ব্যবহার হয় সর্দি এবং কাশিতে। এ ছাড়া আরও অনেক বনৌষধি আছে যা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় তারই কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হল। এখন বলা হবে কি করে এই সমস্ত ভেষজ বনৌষধি গাছপালা থেকে নিষ্কাশন করা হয়।

ভেষজ নির্যাসের প্রণালী

উপক্ষারের নিষ্কাশন—বাজারে যে সমস্ত উপক্ষারের টিংচার বা তরলসার বিক্রী হয় সেগুলি তৈরী হয় সুরাসারে বা এল্‌কোহলে (ethyl alcohol)। লতা গুল্মাদি বা ছাল, পাতা এবং ফুল ভিজিয়ে রাখা হয় সুরাসারে (অল্প অম্লের সংমিশ্রণে) একটি অনুস্রাবণ যন্ত্রে (percolator) প্রায় ২৪ ঘণ্টা থেকে ৬৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। গাছ গাছড়া হতে উপক্ষারগুলি ক্রমে সুরাসারে দ্রবীভূত হতে থাকে। ফলে স্বচ্ছ তরল সুরাসারের রং যায় বদলে। পাতার নির্যাস হয় সবুজ আর শেকড়ের নির্যাস হয় লাল্‌চে। এই সুরাসারের নির্যাস হতে সুরাসার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয় পাতন উপায়ে (distillation)। তারপর যে ঘন কাথটি পাওয়া যায় সেটি উপক্ষারের টিংচার বা তরলসার বলে বিক্রী করা হয়। কিন্তু শুদ্ধ এবং পরিষ্কার উপক্ষার পেতে হলে ঘন কাথটি জলে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন ক্লোরোফিল্‌ (chlorophyll) অর্থাৎ গাছের যে সবুজ রংটি আমরা দেখি সেই সবুজ রং আর ধুনো জাতীয় কিছু আঠা উপক্ষারের নির্যাস হতে আলাদা হয়ে জলের নিচে পড়ে যায় আর জলের মধ্যে চলে যায় উপক্ষারগুলি। উপক্ষারের দ্রবণটি (solution) ছেঁকে নিয়ে তাতে কিছু সোডা বা অ্যামোনিয়া দিলে উপক্ষারটি জল থেকে সাধারণতঃ আলাদা হয়ে যায়। তারপর তাকে পাতন বা কেলাসন (crystallisation) উপায়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

অনুপক্ষারের নির্যাস—ইথার (ether), ক্লোরোফর্ম, বা সুরাসার প্রভৃতি দ্রাবকে (solvent) এদের নির্যাস তৈরি করা হয় উপক্ষারেরই মতো তবে এস্থলে অম্লের ব্যবহার করা হয় না। তারপর দ্রাবকগুলিকে উড়িয়ে দিলেই ঈপ্সিত অনুপক্ষারগুলি পাওয়া যায়।

উদ্বায়ী এবং অনুদ্বায়ী তেল (Essential oil and Fixed oil) —সাধারণতঃ যে সমস্ত তেল উড়ে যায় এবং কাগজে ঢেলে দিলে কোনো চিহ্ন

রেখে যায় না, তাদেরকে বলা হয় উদ্বায়ী তেল। এর উল্টোটা হলে বলা হয় অনুদ্বায়ী তেল।

উদ্বায়ী তেলের নিষ্কাশন—গাছের যে অংশ থেকে উদ্বায়ী তেল তৈরি করতে হবে, সেই অংশগুলি প্রথম গুঁড়ো করা হয়, কিংবা টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। তারপর একটি পাতন যন্ত্রে সেগুলিতে স্টীম (steam) দিয়ে ফুটালে উদ্বায়ী তেলটি বেরিয়ে আসে স্টীমেরই সঙ্গে। এখন এই স্টীমকে ঠাণ্ডা করে তাকে জলে পরিবর্তিত করলে দেখা যায় যে জলের উপর উদ্বায়ী তেলটি ভাসছে, কারণ উদ্বায়ী তেলগুলি সাধারণতঃ জলের চেয়ে হাল্কা হয়। তখন ঐ তেলটি আস্তে আস্তে ঢেলে নেওয়া হয়।

অনুদ্বায়ী তেলের নির্যাস—গাছের বীচি বা গাছের যে অংশ থেকে অনুদ্বায়ী তেল তৈরি করতে হবে সেগুলিকে ছোট ছোট করে কেটে তার থেকে প্রেষ-যন্ত্রের (pressing machine) সাহায্যে তেলটি নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়।

বনৌষধির ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ

কোনো উদ্ভিজ্জ ওষুধ মানুষের কাজে লাগানোর আগে তাকে রসায়নাগারে পরীক্ষা করে তার উপাদানগুলি নিষ্কাশন এবং নির্ধারণ করা হয়। তারপর তার ভৈষজ্যসারগুলি জন্তু জানোয়ারদের শরীরে সুস্থ অবস্থায় এবং রোগের সময় প্রয়োগ ক'রে তাদের গুণাগুণ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ভাবে সারটি নির্দোষ এবং ফলপ্রদ প্রমাণিত হলে হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেটি রোগগ্রস্ত মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়। তারপর ওষুধটির ফলাফল লক্ষ্য করে প্রয়োগের মাত্রা নিরূপণ করবার পর বনৌষধিটি সাধারণের কাজে লাগানো হয়। কিন্তু এ রকম নিখুঁতভাবে ভেষজগুলির পরীক্ষা এবং তাদের সাধারণের কাজে লাগানোর জন্য বনৌষধিদের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন এবং নিষ্কাশনের প্রয়োজন। উৎপাদনের দিক থেকে ভারতীয় বনৌষধির অসুবিধা কিছু নেই কারণ ভারতবর্ষের সংস্থান যথেষ্ট—ইংরাজ শাসিত ভারতের আয়তন মোটামুটি ৮,৫০,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে ১,০০,০০০ বর্গমাইল হচ্ছে সরকারী অরণ্যের পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে আট ভাগের এক ভাগ ; তাছাড়া বেসরকারী অরণ্যও অনেক আছে, এবং শস্যশ্যামল ভারতভূমির উর্বরতার দিক থেকে ত্রুটি কিছু নেই। ভারতের নানা অংশের জলবায়ুর পার্থক্য এত বেশী যে সারা পৃথিবীর যে কোনো ভৈষজ্যরত্ন অল্পায়াসেই ভারতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মাতে পারে। কাজেই এইসব জায়গায় আধুনিক উন্নত কৃষিশিল্পের সাহায্যে ভৈষজ্যগুণসম্পন্ন গাছগাছড়ার ও লতাগুল্মাদির চাষ করলে তাদের উৎপাদনও হবে প্রচুর। আমাদের দেশে রসায়নী ও বিজ্ঞানীর অভাব নেই কাজেই বনৌষধি নিষ্কাশন হতে পারে অতি সহজে। তবে ব্যাপক ভাবে ভৈষজ্য শিল্পের প্রসার আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হচ্ছে না কেন? কারণ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেই ইওরোপীয় চিকিৎসাবিধির প্রচলন হওয়াতে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অনাদৃত হতে থাকে।

বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য অস্ত্রোপচার ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে নানা আশ্চর্য সুফল দেখে দেশের লোকে সেই প্রণালী গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় ভারত-বাসীদের অনেকেরই মনের অবস্থা এমনই পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিলিতী ওষুধের উপর এমনই একটি মোহ তাঁদের জন্মেছে যে, কোনো ভেষজ যদি বিলিতী কোম্পানির ছাপ মারা হয় তাহলে দেশীয় কোম্পানির তৈরী ঐ একই ভেষজ কিনতে তাঁরা আপত্তি করেন, আর বিলিতী কোম্পানির ওষুধটি কেনেন তাঁরা সাদরে। অনেকেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোনো ওষুধ ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস্ (British Drug House) বা পার্ক ডেভিস (Park Davis) যদি তৈরি করেন এবং একই ওষুধ যদি কোনো বিশ্বস্ত দেশীয় কোম্পানি প্রস্তুত করেন তাহলে আমাদেরই দেশের ডাক্তারেরা অনুমোদন করেন ব্রিটিশ ড্রাগ হাউসের বা পার্ক ডেভিসের ওষুধটি, এবং দেশীয় ওষুধটি কিনতে বারণ করে দেন। এর ফলে ভারতে উৎপন্ন বনৌষধি—তাদের পরিমাণ কিছু কম নয়—অতি অল্প দামে ইওরোপে রপ্তানী হচ্ছে এবং পুনরায় আমাদেরই কাছে বিক্রী হচ্ছে ১০ গুণ, ২০ গুণ দামে; লোকে কিনছেও সযত্নে। যেমন, ৩২ হাজার টাকা মূল্যের (৫০ হাজার মণ) কুচিলার বীচি বিদেশ থেকে স্ট্রিক্‌নিন হয়ে ফিরে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় বিক্রী হচ্ছে। এই ভাবে ১৯২০-৩৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩২ লক্ষ টাকার বনৌষধি ভারত থেকে রপ্তানী হয়, এবং শোধিত ভেষজ হয়ে ফিরে এসে বছরে ২ কোটি টাকায় আমাদেরই কাছে বিক্রী হয়েছে।

আমরা যদি আমাদের প্রাচীন ভেষজ শিল্পকে পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে এবং আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গড়ে তুলি তাহলে ওষুধের জন্য বিদেশীর উপর একেবারেই নির্ভর করতে হবে না, এবং ভারতীয় বনৌষধিকে সমুদ্র পার হয়ে ইওরোপ, আমেরিকা থেকে শোধিত হয়ে আসতে হবে না। এর ফলে অতি অল্প দামেই নানা ভেষজ আমাদের দেশবাসীরা কিনতে সমর্থ হবেন। আমরা বনৌষধির বিদেশী বাজার একচেটিয়া করে নিয়ে আমাদের হীন আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারব এবং সেই অর্থে অন্যান্য শিল্পের প্রগতি

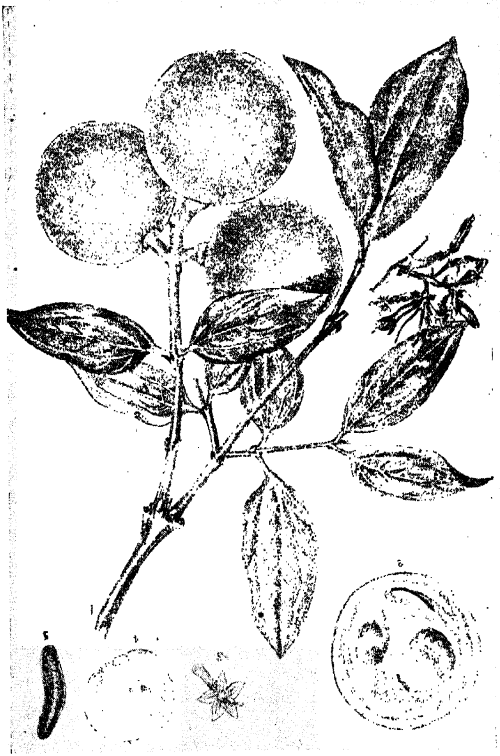
এবং প্রসারের ব্যবস্থা যে সম্ভব হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের নিজেদেরই উচিত ভারতীয় ভেষজ শিল্পকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা, তার জন্য বিলাত, জর্মানি, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মতন ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রিত ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Pharmaceutical Institution) করা এবং উদ্ভিদ ভেষজের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন, নিষ্কাশন এবং তার গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা এবং ভেষজতত্ত্ব ইত্যাদিতে পারদর্শী বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করা, তাহলেই ভারতীয় বনৌষধির সাফল্যজনক গবেষণা সম্ভবপর হবে।



সিঙ্কোনা পৃ ২০

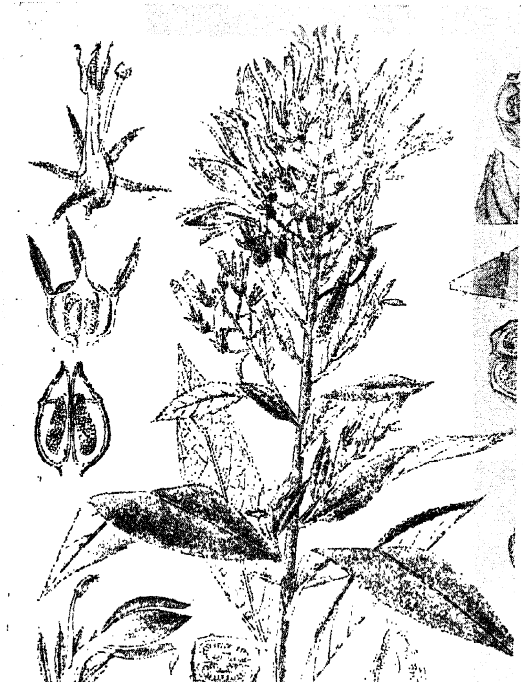


প্ ২২ কুচি

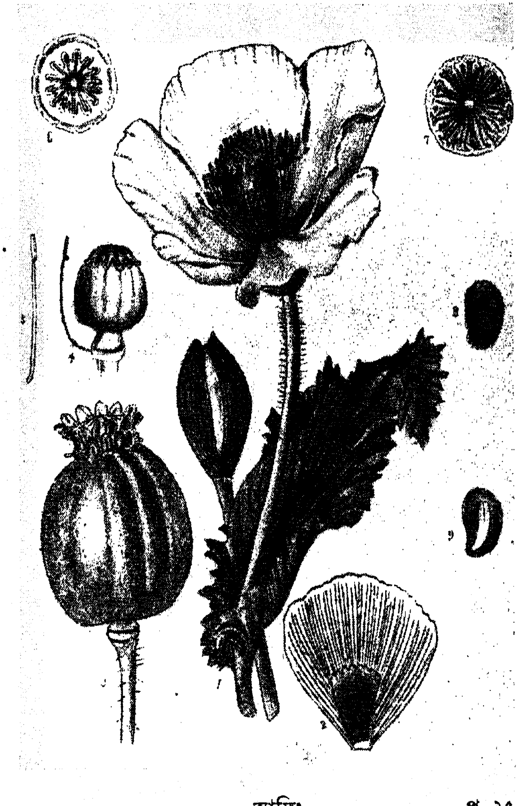


কুচিলা

পৃ ২৩



পৃ ২৪ বনতামাকু



আফিং



পৃ ২৬ বাসক



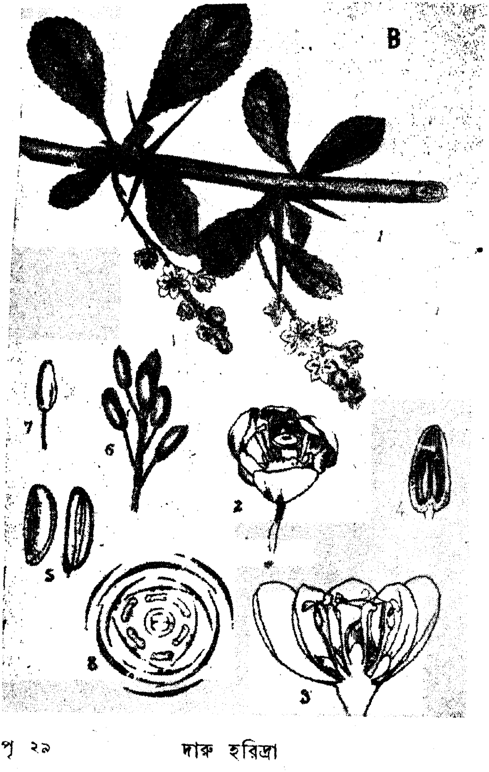
সুঁদরী বনে বড় চাঁদর





পৃ ২৭ বড় চাঁদর

ছোট চাঁদর পৃ ২৮



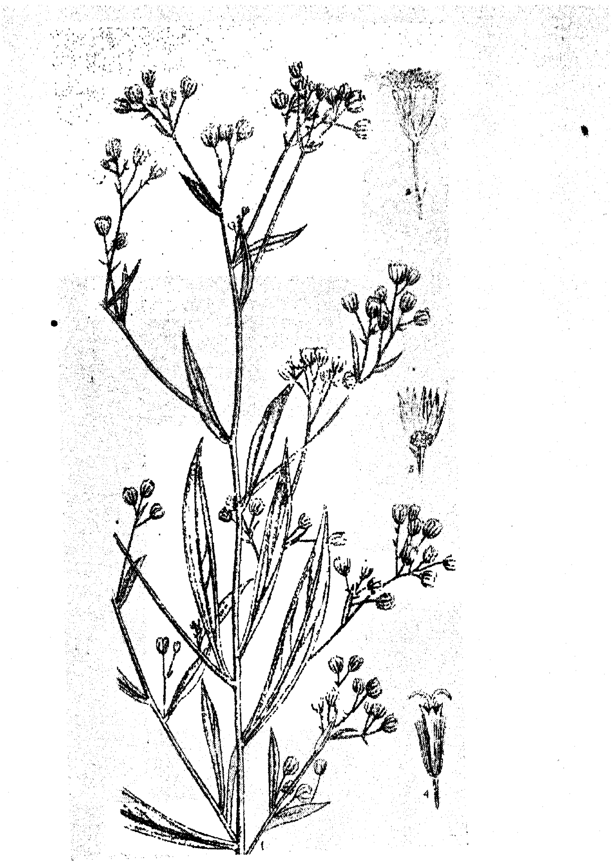
পৃ ২৯ দারু হরিদ্রা



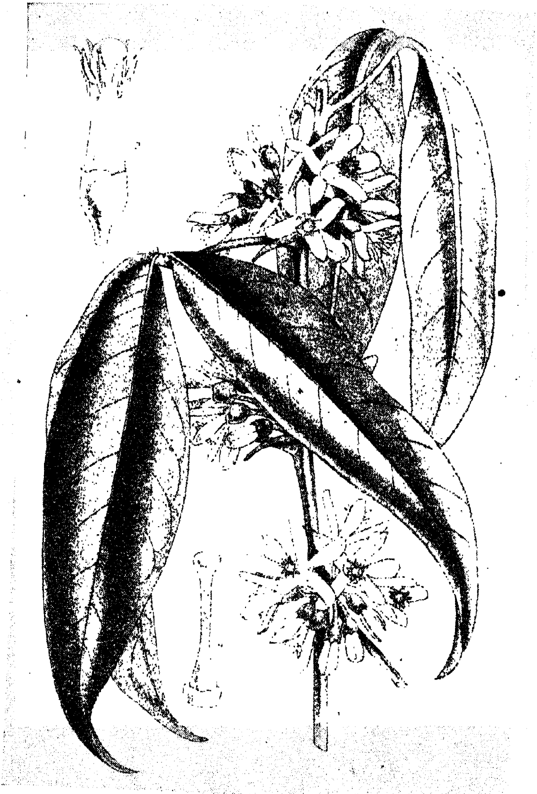
ডিজিটালিস্‌   পৃ ৩২



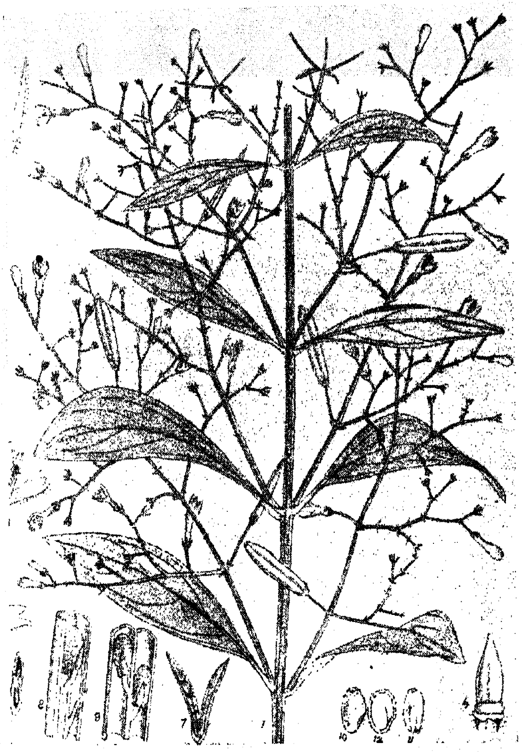
পৃ ৩২ বাভাচী



আয়াপান   পৃ ৩৩



পৃ ৩৪ লবঙ্গলতা



কালমেঘ পৃ ৩৭



পৃ ৩৮ চালমুগ্‌রো

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ত ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়